RAMAKRISHNA VIVEKANANDA MISSION VIDYABHAWAN

MODEL ANSWER FOR ANNUAL EXAMINATION : 2020
Class : IX (ENGLISH MEDIUM)
Subject :- Bengali

Full Marks : 90

1. সঠিক উত্তর নির্বাচন কর ঃ **1x20=20**

1.1 ক) নির্মল শ্বেত কুজ্ঝটিকা দেখে।

1.2 ঘ) বাংলার পরমাসুন্দরী প্রকৃতি রাজ্যে।

1.3 গ) পুরুষ

1.4 ঘ) ক, খ, গ সবগুলোই

1.5 ঘ) সিন্ধি, উর্দু ও কাশ্মীরি

1.6 ক) বন্দীশালার

1.7 ক) অমৃতের টিকা পরে

1.8 ঘ) ইউনিভার্সিটি এগজামিনের রেজাল্ট তৈরী করছিল।

1.9 গ) ঘরের দিকে ফিরলেন

1.10 ক) রিমেমব্রেন

1.11 গ) কোভারুরিয়াস

1.12 খ) চরক সংহিতা

1.13 খ) সাদৃশ্যসূচক অব্যয়

1.14 ঘ) ছাত । ছাদ

1.15 গ) তদ্ভব শব্দকে

1.16 ঘ) ক্রিয়া বিশেষণ

1.17 ক) সকর্মক ক্রিয়া

1.18 ক) সর্বনামীয় বিশেষণ

1.19 ক) মৌলিক ক্রিয়া

1.20 গ) নিত্যবৃত্ত অতীত

2. কমবেশি ১৫টি শব্দের মধ্যে উত্তর দাও ঃ **1x20=20**

ক) মধ্যবিত্ত জীবন থেকে শুরু করে উচ্চবিত্ত জীবনে পরিণত ইলিয়াসের সম্পদ বৈভব দেখে প্রতিবেশীরা ইলিয়াসকে ঈর্ষা করত।

খ) পদ্মাধর ছিলেন মিথিলার একজন নৈয়ায়িক। ইনি ন্যায়শাস্ত্রের অন্যতম ব্যাখ্যাকারক ছিলেন।

গ) জানুক এবং সূচক দুই রক্ষীই ভেবেছিল রাজশ্যালক ধীবরের মৃত্যুর হুকুমনামা নিয়ে আসবে। কিন্তু তার পরিবর্তে রাজশ্যালক তার মুক্তি ও আংটির সমপরিমাণ অর্থ দেওয়ার কথা জানালে জানুক এই মন্তব্যটি করে।

ঘ) গ্রিক, হিব্রু, আবেস্তা এবং ঈষৎ পরবর্তী যুগের আরবি ভাষা সংস্কৃত ভাষার মতো আত্মনির্ভরশীল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ।

ঙ) ভুটিয়ানিরা শ্রমশীলা, কার্যপ্রিয়, সাহসী ও সত্যবাদী হয়।

চ) প্রকৃতির বুকে অন্ধকারের গাঢ়ত্বকে বোঝাতে কবি অজস্র চুলের চুমা কথাটি ব্যবহার করেছেন।

ছ) পৃথিবীতে নতুন নতুন ইতিহাস গড়ে ওঠে।

জ) অনেক বছর আগে আশ্রয়ের খোঁজে মানুষের আসার কথা বলা হয়েছে।

ঝ) মানবসেবার কর্মে ঝাঁপ দেওয়ার পর যে কাজে বিফল হওয়ার এবং কর্মে বিরক্তি আসার সম্ভাবনা থাকতে পারে।

ঞ) স্বামী বিবেকানন্দের বাণী জগৎময় ছুটেছে অর্থাৎ তাঁর মতাদর্শ সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে।

ট) একটি দ্বিকর্মক ক্রিয়ার উদাহরণ হল মাস্টারমশায় আমাদিগকে গল্প বলিলেন। এখানে বলিলেন ক্রিয়ার আমাদিগকে ও গল্প দুটি কর্ম।

ঠ) কোন সিদ্ধ ধাতু বা শব্দের সঙ্গে এক বা একাধিক প্রত্যয় যোগ করে যে ধাতু গঠিত হয় তাকে সাধিত ধাতু বলে। যেমন- হাত শব্দের সঙ্গে আ প্রত্যয়যোগে হয়েছে হাতা। হাতা হল শব্দের সঙ্গে প্রত্যয়নিষ্পন্ন সাধিত ধাতু।

ড) সংস্কৃত উপসর্গ পরি যোগে একটি নতুন শব্দ হল পরিপূর্ণ।

ঢ) সমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহারে বাক্যের গঠন ও অর্থ পূর্ণতা পায়। এবং অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহারে বাক্যের গঠন ও অর্থ পূর্ণতা পায় না।

ণ) মূল ধাতুর সঙ্গে 'আ' প্রত্যয় যোগ করলে কর্মবাচ্যের ধাতু হয়। তার সঙ্গে ধাতুবিভক্তি যোগ করলে কর্মবাচ্যের ক্রিয়া হয়। যেমন - দেখ্+ আ = দেখা (কর্মবাচ্যের ধাতু) + য় (ধাতুবিভক্তি) = দেখায় (কর্মবাচ্যের ক্রিয়া)।

ত) যে ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণের সময় জিহ্বা মূর্ধাকে তাড়িত করে তাকে তাড়নজাতধ্বনি বলা হয়। যেমন - ড়, ঢ়।

থ) যে অব্যয় বাক্যের মধ্যে এক পদের সঙ্গে অন্য পদের অণ্বয় বা সম্বন্ধ স্থাপন করে তাকে বলে পদাণ্বয়ী অব্যয়। যেমন- দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে? এই বাক্যে বিনা শব্দটি হল পদাণ্বয়ী অব্যয়।

দ) একটি নিত্যসম্বন্ধী অব্যয়ের উদাহরণ হল যেমন কর্ম করবে তেমনি ফল পাবে।

ধ) ধাতুর সঙ্গে কৃৎ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে যে শব্দ গঠিত হয় তাই হল কৃদন্ত শব্দ। ডুব+অন্ত = ডুবন্ত হল কৃদন্ত শব্দ।

ন) একটি সাফল্যবাচক সর্বনামের উদাহরণ হল সকলেই এখানে উপস্থিত। বাক্যটিতে সকলেই শব্দটি হল সাফল্যবাচক সর্বনাম।

3. প্রসঙ্গ নির্দেশসহ কমবেশি ৬০টি শব্দে উত্তর দাও ঃ 2X3=6

3.1 নিসর্গপ্রেমিক কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত খেয়া কবিতায় কবি বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করেছেন যে সাধারণ মানবজীবনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে রাজশক্তির ইতিহাসের কাহিনী। তাদের উত্থানপতনের কাহিনী। এখানে কবির ইতিহাস চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। রাজশক্তির জয়লাভের বাসনায় রক্তবন্যা বয়ে যায়। রাজকীয় দম্ভের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় মূল্যবান প্রতীক সোনার মুকুটে। কিন্তু কালের নিয়মে কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়। তাই তা একসময়ে পতনের অতলে তলিয়ে যায়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও খেয়ানৌকার যাতায়াত কিন্তু বন্ধ হয় না।

মানুষের জন্মমৃত্যু যেমন চিরসত্য ঠিক তেমনি খেয়ানৌকার আসা যাওয়ায় সত্য। খেয়ানৌকা চিরপ্রবহমানতার প্রতীক হয়ে উঠেছে।

অথবা

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বিরচিত আমরা কবিতা থেকে উদ্ধৃত আলোচ্য অংশে বিটপাল ও ধীমান নামক দুজন বাঙালি ভাস্করের কথা বলা হয়েছে।

ভাস্কর তাকেই বলা হয় যিনি ধাতু বা প্রস্তর খোদাই করে মূর্তি নির্মাম করেন। তাঁর অন্তরের শিল্পভাবনা ও হাতের কারুশিল্পে দক্ষতার সুনিপুণ মিশেলে নব মূর্তিটিকে তিনি রূপদানে সক্ষম হন। ধীমান এবং বিটপাল হলেন পালযুগের দুজন ভাস্কর যারা বাংলার শিল্পকলার সুন্দর রূপটিকে নিজের কল্পনার আধারে রূপায়িত করেছেন। তাদের ধ্যান অর্থাৎ মননের স্পর্শেই তা ইতিহাস প্রসিদ্ধি লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।

3.2 চন্দ্রনাথ দ্বিতীয় পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়েছিল। তার দাদা নিশানাথ তাকে এই চিঠি প্রত্যাখ্যানের জন্য ক্ষমা চেয়ে হেডমাস্টার মহাশয়কে চিঠি লেখার বিষয়ে বারবার অনুরোধ বা আদেশ করেছিলেন। কিন্তু বিদ্যালয়ের পক্ষপাতমূলক সিদ্ধান্তের দরুণ চন্দ্রনাথ দ্বিতীয় হওয়ায় সে তার দাদার অনুরোধ সত্ত্বেও চিঠি প্রত্যাখ্যানের জন্য ক্ষমা চাওয়ার প্রস্তাবটি মেনে নেয়নি। এই ঔদ্ধত্যের কারণে নিশানাথাবাবু চন্দ্রনাথের ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।

অথবা

নিরুদ্দেশ গল্পের উল্লিখিত অংশে শোভনের বৃদ্ধ বাবার মুখের বেদনাময় বিমূঢ়তার কথা বলা হয়েছে।

বৃদ্ধ নায়েবমশাই যখন নিরুদ্দিষ্ট শোভনকে তারই মত্যু সংবাদ শোনাচ্ছিলেন সেই সময় তার বাবাকে বাড়ি থেকে বোরোতে দেখে। বাবাকে দেখে তার ঝড়ে ভাঙা গাছের মতোই বিশ্বস্ত মনে হচ্ছিল। শোভন দৌড়ে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে যায় এবং ওই বৃদ্ধকে বাবা বলে সম্বোধন করে। বৃদ্ধ সেই গলার আওয়াজ শুনে থমকে দাঁড়িয়ে যান। তখন তার প্রতিক্রিয়া উল্লেখ করতে গিয়েই মন্তব্যটি করা হয়েছে।

4 নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখ ঃ 5x4=20

4.1 হিমালয় দর্শন প্রবন্ধের লেখিকা বেগম রোকেয়া স্বয়ং একথা বলেছেন।

তাঁর পাহাড় দেখার সাধ পূর্ণ হওয়ার কথা বলেছেন।

শিলিগুড়ি থেকে হিমালয়ান রেলগাড়িতে করে পাহাড়ি পথের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে লেখিকা কার্সিয়াং পৌঁছান। সেখানকার নির্মল প্রকৃতি, ঝরনার জলধারা, শীতল বাতাসে তিনি মুগ্ধ হন। আকাশে মেঘের আনাগোনা, পশ্চিম দিগন্তে আকাশে সূর্য অস্ত যাওয়া এই সকল অসাধারণ দৃশ্য দেখে তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েন। পাহাড়ি জনজীবন, ভুটিয়া মহিলাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে লেখিকা প্রত্যক্ষভাবে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। পাহাড়ী মহিলাদের সাহসী শ্রমলীলা, সত্যবাদী রূপ লেখিকা উপলব্ধি করেছিলেন। শহরের প্রকৃতি তাঁকে বারংবার মুগ্ধ করেছে। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির উচ্ছ্বাস লেখিকার তীব্র হয়ে ওঠে। পাহাড়ে এসে লেখিকা এক অপার্থিব মুখের সন্ধান পান। ঈশ্বরের কাছে তিনি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছিলেন। বঙ্গোপসাগর দেখে লেখিকার সমুদ্র দর্শনের সাধ মিটেছিল এবং তার পাহাড় দর্শনের সাধও এবার পরিপূর্ণ হল।

4.2 আলোচ্য উদ্ধৃতাংশটি সৈয়দ মুজতবা আলীর লেখা নব নব সৃষ্টি প্রবন্ধ থেকে গৃহীত হয়েছে। রচনার গাম্ভীর্য, চটুলতার সঙ্গে ভাষার ব্যবহার গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। নতুন শব্দ তৈরী বা বিষয়ের মধ্য দিয়ে নতুন চিন্তা ও অনুভূতি ফুটিয়ে তুলতে গেলে বিদেশী ভাষার প্রয়োজন। শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরাজী ভাষা বাতিল করার ফলে বাংলা ভাষায় বিদেশী শব্দ আরও বেশি করেই প্রবেশ করেছে। যদি বিষয়কেন্দ্রিক হয় তবে বিদেশী শব্দ কোনভাবেই লেখার মাধুর্যকে নষ্ট করতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ আরবি ফারসিকে স্বাগত জানিয়ে খুব স্বচ্ছন্দেই লিখেছেন 'আব্রু দিয়ে, ইজগৎ দিয়ে, ইমান দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে।' নজরুল ইসলামও 'ইনকিলাব', 'শহীদ' প্রভৃতি শব্দ অনায়াসেই ব্যবহার করেছেন।

শংকর দর্শন আলোচনায় রয়েছে গাম্ভীর্য ও আভিজাত্য। সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারে তা সঠিকরূপ লাভ করেছে। বসুমতী পত্রিকায় সম্পাদকীয় ভাষাও এইরকম গম্ভীর প্রকৃতির। কিন্তু বাঁকা চোখে পত্রিকার ভাষায় চটুলতা তার বিষয় উপযোগী। রেলের ইঞ্জিন কীভাবে তৈরী হয় কিংবা বিজ্ঞানচর্চা ও দর্শনের বিষয় জানতে ইংরাজী ভাষার বিকল্প নেই। সুতরাং সঠিক ভাষা প্রয়োগ বিষয়বস্তুর মূলভাবকে তুলে ধরতে পারে।

অথবা

প্রশ্নোদ্ধৃত মন্তব্যটির বক্তা 'ধীবর বৃত্তান্ত' নাট্যাংশের অন্যতম চরিত্র স্বয়ং ধীবরের।

ধীবরের কাছে মণিখচিত ও রাজার নাম খোদাই করা আংটিটি দেখে রাজশ্যালক এবং দুই রক্ষী তাকে চোর সাব্যস্ত করে। ধীবর চুরির দায় অস্বীকার করায় তারা তার জাতি পরিচয় নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রুপ করে। ধীবর নিজের জীবিকার পরিচয় দেয়। অনেক তির্যক ব্যঙ্গ তাকে এর জন্য সহ্য করতে হয়। ধীবর জানায় যে একটি রুই মাছকে টুকরো করে কাটার পর তার পেটের ভিতর থেকে সে আংটিটা পেয়েছে। পরে ওই আংটি বিক্রি করতে গিয়ে সে ধরা পড়ে।

উক্ত কথাগুলি বলার পরই ধীবর মন্তব্যটি করেছিল যা প্রমাণ করে সে সৎ, সত্যবাদী, স্পষ্টবক্তা এবং একই সঙ্গে নম্র ও ভদ্রও বটে। সে কর্কশ স্বরে তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের জবাব দেয়নি। তার বদলে সে বিনীতভাবে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছে।

4.3 চন্দ্রনাথ হল নরেশ ও হীরুর সহপাঠী এবং নিশানাথবাবুর ভাই। অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও দৃপ্ত চরিত্রের অধিকারী ছিল সে। নির্ভীক ছিল তার দুচোখের দৃষ্টি। মুখশ্রীও ছিল অদ্ভুত। মোটা নাক, সামান্য চাঞ্চল্য কিংবা উত্তেজনাতেই তা ফুটে ওঠে। কিশোর বয়সেই তার চরিত্রে ছিল আশ্চর্য এক ব্যক্তিত্ব। সেই ব্যক্তিত্বের জোর তার পড়াশোনাতেও ছিল। কোনদিন স্কুলের পরীক্ষায় সে প্রথম ছাড়া দ্বিতীয় হয় নি।

চন্দ্রনাথের দৃঢ় ব্যক্তিত্বের কারণেই সমস্ত স্কুল চঞ্চল ও বিক্ষুব্ধ। স্কুলের পরীক্ষার ফলাফল কী হবে তা সে অনেক আগে থেকেই বলে দিয়েছিল। স্কুলের সেক্রেটারির ভাইপো নানা সুবিধা নিয়েই প্রথম হয়েছে এবং স্কলারশিপ পেয়েছে। অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার হীরুর প্রাইভেট মাস্টার ছিলেন এবং তিনি স্কুলের প্রশ্নপত্র গোপন রাখেন নি। উত্তর বিচারের সময় বেশ কিছু ক্ষেত্রে পক্ষপাত দেখিয়েছিলেন তিনি। পরীক্ষার হলে চন্দ্রনাথের খাতা থেকে তিনটি অঙ্ক টুকেছিল হীরু। কাজেই খুব সহজেই পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে স্বচ্ছ হয়ে গিয়েছিল চন্দ্রনাথ। কিন্তু সেই আস্থা অনুযায়ী স্কুলের রেজাল্ট তৈরী হয় নি। চন্দ্রনাথ প্রতিবারের মতো যোগ্যতার পরীক্ষায় প্রথম স্থান পায় নি। সে দ্বিতীয় হয়েছিল। অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও হীরু প্রথম স্থান এবং স্কলারশিপ দুইয়েরই অধিকারী হয়েছিল। এই অবিচার চন্দ্রনাথ মেনে নিতে পারে নি। প্রতিবাদ করেছিল এবং নিজের সেকেন্ড প্রাইজ প্রত্যাখ্যান করে পত্র দেওয়ার ফলেই সমস্ত স্কুল বিক্ষুব্ধ ও চঞ্চল হয়ে উঠেছিল।

অথবা

প্রেমেন্দ্র মিত রচিত নিরুদ্দেশ গল্প থেকে নেওয়া উদ্ধৃতিটির বক্তা হল কথকের বন্ধু সোমেশ। বহু বছর আগে প্রধান একটি সংবাদপত্রে পাতায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পেয়েছিল একটি নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপন। সেই বিজ্ঞাপন সম্পর্কে উপরোক্ত মন্তব্যটি বলা হয়েছে।

শোভন নামে একটি ছেলে নিজের খেয়ালেই বাড়ি ছাড়ে। প্রাচীন জমিদার বংশের একমাত্র উত্তরাধিকারী শোভন জন্ম নিয়েছিল একেবারে নির্লিপ্ত মন নিয়ে। তার কোনরকম বিষয়াসক্তি ছিল না। সে পরিবারের আদর ভালোবাসায় আমল না দিয়ে বেড়িয়ে পড়েছিল বাইরের জগতে মুক্তির স্বাদ পেতে। এই শোভনের নিরুদ্দেশ হবার বিজ্ঞাপন বের হচ্ছিল প্রধান সংবাদপত্রের পাতায়। বিজ্ঞাপনের আড়ষ্ট ভাষায় অদ্ভুত এক ব্যাকুলতা প্রকাশ পাচ্ছিল। ক্রমশ প্রকাশ হয়েছিল বাবা মায়ের কাতর অনুরোধ, হতাশা যন্ত্রণাদায়ক হাহাকার। পরবর্তীকালে শোভনের খোঁজ দিতে পারলে পুরস্কার দেওয়া হবে একথাও ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু সবকিছু দেখা সত্ত্বেও কোনরকম বিচলিত হয় না শোভন। প্রায় দু বছর এই বিজ্ঞাপন চলার পর হঠাৎই একদিন শোভনের নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপন একদিন বন্ধ হয়ে যায়।

বিজ্ঞাপন বন্ধের পর শোভন অত্যন্ত বিচলিত হয়ে ওঠে। একদিন হঠাৎ বাড়ি ফিরে সে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। কোন পুরানো কর্মচারী তার ফিরে আসাকে কেন্দ্র করে কোনরকম আগ্রহ প্রকাশ করে না। সেই আসলে শোবন কিনা এ নিয়ে সকলের মনে সংশয় তৈরী হয়। কথা প্রসঙ্গে সে জানতে পারে একাধিক জন শোভন নাম নিয়ে বাড়িতে এসেছে। এরপর বাড়ির লোক খবর পেয়েছে সাতদিন আগে শোভন পথ দুর্ঘটনায় মারা গেছে। এমন পরিস্থিতিতে শোভন তার বাবার কাছে ছুটে গেলেও বৃদ্ধ পিতা তাকে চিনতে পারে নি। ফলে জীবিত হওয়া শোভনের জীবনে ঘটে গেছে অস্তিত্বের সংকট। বিজ্ঞাপনের পিছনে এই ইতিহাসই লুকিয়ে রয়েছে।

4.4 উদ্ধৃতাংশটি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ভাঙার গান কবিতার অন্তর্গত।

কবি এখানে ব্রিটিশ রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত সমস্ত বন্দীশালালাকে ভেঙে ফেলার কথা বলেছেন। বন্দীশালার লৌহ কপাট, তালা ভেঙে সেখানেই আগুন জ্বালিয়ে দেওয়ার কথা কবি উচ্চকিত কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন।

পরাধীনতার শৃঙ্খলে ভারতবাসী দীর্ঘদিন জর্জরিত থাকার পর এক সময় স্বাধীনতা প্রত্যাশী হয়ে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। তারা স্বাধীনতা চায়। সর্বস্তরের মানুষ আজ আন্দোলনে যোগ দেয়। ব্রিটিশ সরকারও আন্দোলন প্রতিরোধ করার জন্য নানা পাশবিক কৌশল ব্যবহার করতে থাকে। সরকারের এই নির্মম কঠোর দমননীতি একদিকে যেমন সাধারণ মানুষকে তারা জেলবন্দীও করতে থাকে এইসব বন্দীশালা থেকে ভারতবাসীকে মুক্ত করতে হবে - এই ছিল কবির দৃঢ় অঙ্গীকার। তাই কবি সাম্রাজ্যবাদী বিরোধী মানসিকতায় বীর্যদীপ্ত কণ্ঠে শুধু দুর্জয় দুরন্ত প্রাণশক্তিতে ভরপুর যুবসম্প্রদায়কে নয়, গণ আন্দোলনে যুক্ত সমস্ত মানুষকে এইসব বন্দিশালা ভেঙে ফেলতে ও তাতে আগুন জ্বালিয়ে দিতে আহ্বান জানিয়েছেন।

5.1 প্রফেসর শঙ্কু তাঁর মৃত্যুমুখী বাবার কাছ থেকে স্বর্ণপর্ণী এবং তার গুণাগুণ সম্পর্কে জানতে পারেন। তবে স্বর্ণপর্ণী গাছের প্রাপ্তিস্থান সম্বন্ধে জানতে পারলেও তা সংগ্রহ করে বাবার মৃত্যু শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধ করতে পারেন নি।

তবে বাবার মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধশান্তি সমাপন করে প্রফেসর শঙ্কু গিরিডি থেকে কালকা হয়ে কসৌলি পৌঁছান। এরপর সেখানকার এক হোটেলে উঠে হোটেলের মালিকের সহায়তায় ঘোড়ার পিঠে করে চামুন্ডা মন্দিরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। ঘোড়ার মালিক ছোটেলাল অন্য একটি ঘোড়ায় তার সঙ্গে ছিল। জঙ্গলের কাছে পৌঁছে ঘোড়া দুটোকে গাছের সঙ্গে বেঁধে শঙ্কু জঙ্গলে প্রবেশ করেন এবং ছোটেলালও তাঁর সঙ্গে যায়। পনেরো মিনিট হাঁটার পর তারা এক ঝরণার পাশে পাতাওয়ালা গাছের ছায়ার ফাঁক দিয়ে আসা সূর্যের আলোয় ঝলমল করতে দেখেন কোমর সমান উঁচু হলুদ পাতায় ভরা একটি গাছড়া। ওই গাছটিই যে স্পর্ণপর্নী তা শঙ্কু সহজেই বুঝে যান। তাই ছোটেলালেল সহায়তায় কোদাল দিয়ে গাছটা শিকড়সহ তুলে তিনি গিরিডিতে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন।

অথবা

আলোচ্য উদ্ধৃতাংশটি বক্তা ত্রিপুরেশ্বর শঙ্কু।

প্রফেসর ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কুর পিতা হলেন ত্রিপুরেশ্বর শঙ্কু। তিনি গিরিডির অপ্রতিদ্বন্দ্বী আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক ছিলেন। তাঁকে ওখানকার লোকেরা বলত ধন্বন্তরি। স্বভাবতই তিনি যথেষ্ট উপার্জন করেছিলেন। কিন্তু পেশাদার প্র্যাকটিসের বাইরে তিনি বহু দরিদ্র রোগীর বিনা পয়সায় চিকিৎসা করতেন। তাঁর মতে ক্ষমতা থাকলেই প্রচুর উপার্জন করতে হবে এর কোন মানে নেই। তিনি বিশ্বাস করতেন জীবনের প্রকৃত সার্থকতা এবং আনন্দ লুকিয়ে আছে, যারা অসুখী দরিদ্র নিরক্ষর দৈব দুর্বিপাকে উপার্জনে অক্ষম, সেইসব মানুষদের দুঃখ লাঘব করার মধ্যে দিয়ে। ত্রিপুরেশ্বর শঙ্কু ছিলেন যথার্থই মানবদরদি। অন্যের দুঃখ দুর্দশায় তিনি ব্যথিত হতেন বলেই ছেলেকেও সেই উপদেশ দিতেন। আবার শিক্ষার ব্যাপারেও তিনি সমগ্রতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাই প্রফেসর শঙ্কু বিজ্ঞানের মেধাবী ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পড়াশোনার পরামর্শ দেন। ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী এই মানুষটি, শঙ্কু যখন প্রয়োজনীয়তা না থাকলেও আত্মমর্যাদার প্রশ্নে স্বাবলম্বী হওয়ার কথা বলেন, তিনি তাঁর এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেরও তাঁর যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল তা স্বর্ণপর্ণীর প্রসঙ্গে চরক সংহিতার উল্লেখ থেকেই বোঝা যায়। সাধুর কাছে এই জীবনদায়ী ওষুধের সন্ধান পাওয়া সত্ত্বেও তিনি নির্বিকার থাকেন। তাঁর শারীরিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কসৌলির দূরত্বের কথা বুঝে শঙ্কুকে ব্যতিব্যস্ত হতে নিষেধ করেন। অসুস্থতা ও মৃত্যুকে জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে গ্রহণ করার সৎসাহস ছিল ত্রিপুরেশ্বর শঙ্কুর মধ্যে। সর্বদিক থেকে বিচার করলে তাকে সৎ, আদর্শবাদী, নির্লোভ এই মানুষটিকে এক অনন্য চরিত্রের অধিকারী বলেই স্বীকার করে নিতে হয়।

6.1 সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান,

সংকটের কল্পনাতে হয়ো না ম্রিয়মান।

মুক্ত করো ভয়,

আপনা-মাঝে শক্তি ধরো নিজেরে করো জয়।

আত্মপ্রকাশের অন্যতম অন্তরায় সংকোচ। মানুষ পদে পদে থমকে দাঁড়ায়। আত্মবিশ্বাসের অভাবে নিজের সামর্থ্যটুকুর সে সদ্ব্যবহার করতে পারে না। তাই সংকোচ বিহ্বলতা আত্ম-অপমানেরই নামান্তর হয়ে ওঠে।

মানুষের জীবনে অগ্রগতির আর একটি প্রতিবন্ধকতা হল সংকটকল্পনা। সংকটের সম্ভাবনার কথা ভেবে নিয়ে অনেকে ম্রিয়মান হয়ে পড়ে, হারিয়ে ফেলে কাজের উদ্যম। এইরকম সংকোচ বিহ্বল ও সংকটভীরু মানুষেরা কঠোর জীবনসংগ্রামকে ভয় পায়। প্রতিটি পদক্ষেপে প্রকাশ পায় তাদের আত্মশক্তির দীনতা। জীবনে সার্থকতা অর্জন করতে হলে এই মানসিক বাধাগুলিকে অতিক্রম করতে হবে। তাই মন থেকে সমস্ত সংকোচ যেমন দূর করতে হবে, তেমনি সংকট চিন্তায় বিষণ্ণ হয়ে বসে থাকলেও চলবে না। নির্ভীক চিত্তে এগিয়ে চলার ব্রত গ্রহণ করতে হবে।

6.2 (সংকেত) এক শিশু ..... দাবীদার হয়ে এল দুই মহিলা। বিচারক শিশুটিকে দ্বিখন্ডিত করে ভাগ করার বিধান দিতেই প্রকৃত মায়ের কান্না, বিচারকের সত্য উপলব্ধি।

প্রকৃত মা

বহুদিন আগের কথা। শহরের একটি কোণে একটি শিশু আর পাঁচটা সাধারণ শিশুর মতই বড় হয়ে উঠেছিল। একদিন এক ভিনদেশী মহিলা এসে জানায় সেই-ই শিশুটির প্রকৃত মা। এ ঘটনায় প্রতিবেশীরা বিস্মিত হয়। বিরক্তও হয়। কিন্তু নবাগতা মহিলাটি নাছোড়। সে তার সন্তানকে না নিয়ে বাড়ি ফিরবে না। এদিকে শিশুটির পিতাও সেখানে নেই। ফলে দুই মহিলার মধ্যে বিতর্ক ক্রমশ বাড়তে থাকে। দেশের পন্ডিত থেকে মন্ত্রী কেউ এই সমস্যার সমাধান করতে পারল না। এদিকে দুই মহিলার টানাটানিতে শিশুটির প্রাণও ওষ্ঠাগত। অবশেষে দুই মহিলা শিশুটিকে নিয়ে গেলেন বিচারকের কাছে। বিচারক সব শুনলেন। শিশুটিকেও তার প্রকৃত মা কে তা জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু শিশুটি এ সব ঘটনায় তখন হতভম্ব হয়ে পড়েছে। বিচারক অবশেষে শিশুটিকে সমান দু-টুকরো করে কেটে ফেলে দুজনকে দিয়ে দেবার আদেশ করলেন। একথা শুনে দ্বিতীয় মহিলাটি খুশি হলেও প্রথম মহিলাটি আঁতকে উঠল। সে কাঁদতে কাঁদতে বিচারকের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল। বিচার ফিরিয়ে নিতে বললেন। বিচারক এ প্রস্তাবে সম্মত হলেন না। তখন প্রথম মহিলাটি স্বেচ্ছায় নিজের দাবি প্রত্যাহার করে নিল। কারণ সে তার সন্তানকে যথার্থই ভালোবাসে। বিচারকের কথা অনুযায়ী তাকে দ্বিখন্ডিত করলে সে তার সন্তানের দেহটুকুই পাবে সন্তানকে পাবে না। সন্তানের জন্যই তিনি সন্তানের উপর থেকে তার সমস্ত অধিকারের দাবী প্রত্যাহার করে নিল। তখন বিচারক বুঝলেন এই প্রথম মহিলাটিই শিশুটির প্রকৃত মা, বিচারক তার হাতেই শিশুটিকে তুলে দিলেন।

নীতি ঃ ভালোবাসা যথার্থ হলে সমস্ত অধিকার ত্যাগ করা যায়।

6.3 নদী কভু পান নাহি করে নিজ জল,

তরুগণ নাহি খায় নিজ নিজ ফল।

গাভী কভু নাহি করে নিজ দুগ্ধ পান,

কাষ্ঠ দগ্ধ হয়ে করে পরে অন্নদান।

বংশী করে নিজ সুরে অপরে মোহিত,

স্বর্ণ করে নিজ রূপে অপরে শোভিত।

শস্য জন্মাইয়া নাহি খায় জলধরে,

সাধুর ঐশ্বর্য তবু পরহিত তরে।

পরের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করার মধ্যেই মনুষ্যজন্মের পরম সার্থকতা নিহিত থাকে। এ বিশ্বজগতে মহৎ ব্যক্তিরাই পরের কল্যাণে, দেশ ও দশের মঙ্গলার্থে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। আত্মদানের মধ্য দিয়েই জীবনের জয়গান গেয়েছেন। আত্মসুখে মগ্ন স্বার্থপর মানুষ জীবনের মহত্বকে কখনোই উপলব্ধি করতে পারে না। নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে জীবন তা ক্ষুদ্র ও সংকুচিত। পরার্থে উৎসর্গীকৃত যে জীবন তা মহৎ ও প্রসারিত। জগতে যাঁরা স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন তাঁরা ক্ষুদ্র স্বার্থকে বলি দিয়েছেন। ভোগের আকাঙ্খাকে পরিহার করেছেন এবং অপরের স্বার্থকে বড়ো করে দেখেছেন। মানুষের মঙ্গল চেতনাই তাঁদের জীবনসাধনা। প্রকৃতির খোলামেলা প্রাঙ্গণেও চলেছে সেই বৃহত্তর সাধনা । কারণ, পরার্থে জীবনদান ও নিজের স্বার্থকে বর্জনই মনুষ্যত্বের প্রকৃত ধর্ম।

6.3 নদী কভু পান নাহি করে নিজ জল,
তরুগণ নাহি খায় নিজ নিজ ফল।
গাভী কভু নাহি করে নিজ দুগ্ধ পান,
কাষ্ঠ দগ্ধ হয়ে করে পরে অন্নদান।
বংশী করে নিজ সুরে অপরে মোহিত,
স্বর্ণ করে নিজ রূপে অপরে শোভিত।
শস্য জন্মাইয়া নাহি খায় জলধরে,
সাধুর ঐশ্বর্য তবু পরহিত তরে।

পরের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করার মধ্যেই মনুষ্যজন্মের পরম সার্থকতা নিহিত থাকে। এ বিশ্বজগতে মহৎ ব্যক্তিরাই পরের কল্যাণে, দেশ ও দশের মঙ্গলার্থে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। আত্মদানের মধ্য দিয়েই জীবনের জয়গান গেয়েছেন। আত্মসুখে মগ্ন স্বার্থপর মানুষ জীবনের মহত্ত্বকে কখনোই উপলব্ধি করতে পারে না। নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে জীবন তা ক্ষুদ্র ও সংকুচিত। পরার্থে উৎসর্গীকৃত যে জীবন তা মহৎ ও প্রসারিত। জগতে যাঁরা স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন তাঁরা ক্ষুদ্র স্বার্থকে বলি দিয়েছেন। ভোগের আকাঙ্খাকে পরিহার করেছেন এবং অপরের স্বার্থকে বড়ো করে দেখেছেন। মানুষের মঙ্গল চেতনাই তাঁদের জীবনসাধনা। প্রকৃতির খোলামেলা প্রাঙ্গণেও চলেছে সেই বৃহত্তর সাধনা । কারণ, পরার্থে জীবনদান ও নিজের স্বার্থকে বর্জনই মনুষ্যত্বের প্রকৃত ধর্ম।

7.1 চরিত্র গঠনে খেলাধূলার ভূমিকা

"খেলা মোদের লড়াই করা,
খেলা মোদের বাঁচা মরা,
খেলা ছাড়া কিছুই কোথাও নাই।"

ভূমিকা ঃ শিক্ষা ও খেলাধূলা - এই দুই সার্থক প্রয়োগেই মানবজীবন সার্থকতামন্ডিত হয়ে ওঠে। কারণ, স্বাস্থ্যবান ব্যক্তিই প্রকৃত সুখসম্পদের অধিকারী হয় ও বুদ্ধির জাল বুনে সে সকল প্রতিকূলতাকে জয় করতে পারে। দেহ ও মনের পূর্ণ বিকাশের মধ্য দিয়ে মানুষের পূর্ণাঙ্গ চরিত্র গঠন সম্ভব হয়। তাই মন ও শরীরের সমপ্রবাহী বিকাশধারা অব্যাহত রাখতে প্রয়োজন যথাযথ শিক্ষালাভের পাশাপাশি পরিমিত মাত্রায় খেলাধূলা।

খেলাধূলার শ্রেণিকরণ ঃ

খেলার স্থানানুযায়ী খেলাধূলা দ্বিবিধ - ১) ইনডোর গেমস বা ঘরের ভিতর অনুষ্ঠিত খেলাধূলা ও (২) আউটডোর গেমস বা মাঠে বৃহদাকারে আয়োজিত খেলা। আমরা লুডো, ক্যারাম, দাবা, ব্যাডমিন্টন ইত্যাদিকে ইনডোর গেমস বলে থাকি। অপরপক্ষে ক্রিকেট, ফুটবল, হকি ইত্যাদি বহু প্রচলিত ও জনপ্রিয় খেলাগুলিকে আউটডোর গেমস-এর পদমর্যাদা প্রদান করা হয়।

খেলাধূলা ও চরিত্র গঠনের সূত্রপাত ঃ

শৈশবকাল থেকে খেলাধূলার মাধ্যমেই ব্যক্তির চরিত্র গঠনের কাজ শুরু হয়ে যায়। জন্মলগ্ন থেকে হাত-পা ছুঁড়ে খেলার মাধ্যমে। নিজের মনোভাব প্রকাশের দ্বারা সে শিখন প্রক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটে। তারই প্রসার ঘটে পুতুল খেলার মাধ্যমে সম্পর্ক তৈরিতে। ফলে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশু যখন গৃহকোণ ত্যাগ করে ক্রীড়াঙ্গণে প্রবেশ করে তখন সে বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানে অপারক হয়ে ওঠে।

শৃঙ্খলাবোধের জাগরণ ঃ

নিয়মিত খেলাধূলা ও শরীরচর্চা ব্যক্তিবিশেষকে শৃঙ্খলাবোধ সম্পন্ন, সংযমী মনোভাবাপন্ন ও আদর্শবাদী করে তোলে। খেলার মাঠে প্রাপ্ত দলগত ঐক্য ও শৃঙ্খলাবোধের ধারণা পুঁথিগত বিদ্যাভ্যাসে সম্ভব নয়। খেলাধূলায় নেতৃত্ব প্রদানের দ্বারা শিশুর মধ্যে লুক্কায়িত অধিনায়কটি পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়।

যন্ত্রনির্ভরতার যুগে শরীরচর্চার গুরুত্ব ঃ

বর্তমানে যন্ত্র নির্ভরতার যুগে যেখানে জীবনের সর্বত্র যন্ত্রদানবের অবাধ যাতায়াত সেখানে কায়িক পরিশ্রমের সমতুল্য শরীর চালনা ব্যতীত বিভিন্ন নবাগত অসুখের কবলস্থ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। ক্ষুধামান্দ্যর মতো সাধারণ অসুখ থেকে শুরু করে হার্ট অ্যাটাক ওবেসিটি প্রভৃতি নানাপ্রকার জটিল রোগের উদ্ভাবনা মানুষকে মৃত্যুমুখী করে তুলতে পারে। তাই নারী পুরুষ নির্বিশেষে প্রয়োজনানুযায়ী ব্যায়াম ও খেলাধূলা করা তাদের শরীর মন সব কিছুর জন্যই দরকার।

উপসংহার ঃ

কোনো ব্যক্তিরই জীবনপথ কুসুমাস্তীর্ণ হয় না বরং কণ্টকের বিস্তৃর্ণ আবরণ জীবনের প্রবাহকে বারংবার বাধা প্রদান করে। নীরোগ শরীরের পক্ষেই সম্ভব জীবনের যাবতীয় কণ্টকগুলি ধীরে ধীরে উপড়ে ফেলা এবং এই নীরোগ শরীর প্রাপ্তি সম্ভব একমাত্র খেলাধূলার মাধ্যমেই। বিপদ-ভয়হীন, নিশঙ্ক, উদারচেতা এক ভবিষ্যৎ মানবের জন্ম দেয়। খেলাধূলাই মানুষকে রুক্ষ কঠিন পথে সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে চলতে সাহায্য করে।

7.2 বিশ্ব উষ্ণায়ন ও তার প্রতিকার

''দাও ফিরে সে অরণ্য লও এ নগর
লও যত লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর
হে নব সভ্যতা।'' - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভূমিকা ঃ শতাব্দীর সূর্য যখন মধ্য-গগনে তখন সভ্যতা বিস্তারের সর্বনাশী খেলার ফলশ্রুতিতে মানবজীবনে ঘনিয়ে আসে বিশ্ব উষ্ণায়নের অভিশাপ। দ্রুত নগরায়ণ ও শিল্পায়নের হাত ধরে প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন ও নির্বিচার বৃক্ষ হননের ফল হল পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান উষ্ণতা। বিশ্ব-প্রকৃতির ভারসাম্য বিঘ্নিত হওয়ায় বর্তমান যুগে উত্তরোত্তর উষ্ণতার পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। উষ্ণতার এই ক্রমবর্ধমান দশাই বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় বিশ্বউষ্ণায়ন বা 'গ্লোবাল ওয়ার্মিং' নামে পরিচিত।

বায়ু মণ্ডলে অবস্থিত কার্বন ডাই অক্সাইড মিথেন, জলীয়বাষ্প প্রভৃতি গ্রিনহাউস গ্যাস প্রকৃতিতে উষ্ণতা বজায় রাখে। কিন্তু কোনোভাবে তাদের পরিমাণ বেড়ে গেলে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে বিকরিত রশ্মি ভূ-পৃষ্ঠে ফিরে এসে বাড়িয়ে তোলে তার উষ্ণতা। উনিশ থেকে বিশ শতকের মধ্যে বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা গড়ে প্রায় ১ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড করে বেড়ে গেছে।

বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণ ঃ বিজ্ঞানীরা বিশ্ব উষ্ণায়নের অনেকগুলি কারণ নির্দিষ্ট করেছেন - (১) বিভিন্ন জীবাশ্ম জ্বালানির দহনের ফলে বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের ক্রমবৃদ্ধি (২) শস্যক্ষেত্রে অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক প্রয়োগ এবং জৈবমল ও পচিত উদ্ভিদের মাত্রা বৃদ্ধির ফলে বায়ুমন্ডলে মিথেন গ্যাসের পরিমাণ (৩) কৃষিক্ষেত্রে নির্বিচারে নাইট্রোজেন ব্যবহার (৪) শিল্পক্ষেত্রে দ্রাবক, এরাসেল রিপসেন্ট, প্লাস্টিক ফোম ও প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত ঠান্ডা মেশিনগুলির ব্যবহারের ফলে ক্লোরোফ্লুরো কার্বনের পরিমাণ বৃদ্ধি (৫) উন্নত জনজীবনের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমবর্ধমান বৃক্ষছেদনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বিশ্ব উষ্ণায়ন।

বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব ঃ

বিশ্ব উষ্ণায়নের ভয়াবহ পরিণতিতে বরফাচ্ছাদিত পর্বত, অন্তহীন সমুদ্র, কল্লোলিত ঝরনা ও নদী হিমময় মেরুদেশ, বিস্তৃর্ণ মরুরাজ্য, গভীর অরণ্য, জীবনের কলরবে মুখরিত জনপদ ক্রমেই নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। ১৯৮২ থেকে পেরুর সমুদ্রোপকূলে সৃষ্ট 'এল নিনো' নামক আবহাওয়ার এক জটিল প্রক্রিয়া অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির সমস্যাকে ক্রমাগতই জটিলতর করে তুলছে।

সমীক্ষায় জানা গেছে উত্তরমেরুর বরফ অধ্যুষিত অঞ্চলে বরফের পরিমাণ ৫.৯ মিলিয়ন বর্গমিটার থেকে ২.৯ মিলিয়ন বর্গমিটারে পর্যবসিত হয়েছে এবং অচিরেই তা সম্পূর্ণ অপসৃত হয়ে সমুদ্রে বিশাল জলোচ্ছ্বাস সৃষ্টি হবে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা।

বিজ্ঞানীদের অপর অনুমান ক্রমপ্রসরমান উষ্ণায়নের প্রভাবে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে গিয়ে শুষ্ক মরুরাশিতে পূর্ণ হয়ে যাবে সমগ্র পৃথিবী। সর্বাংশে ধ্বংস হয়ে যাবে প্রকৃতি ও পৃথিবী।

প্রতিরোধ ব্যবস্থা ঃ ১৯৬৫ তে আমেরিকার বিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রথম বিশ্ব উষ্ণায়নের ভয়াবহতা বিষয়ে উদ্‌বিগ্নতা প্রকাশ পেয়েছে। এই বিষয়ে ১৯৭৯-এ জেনেভা সম্মেলন ও ২০০৭-এ অপর এক সম্মেলন আয়োজিত হয়। অনুমান করা যায়, জীবাশ্ম জ্বালানির দহন কমিয়ে অপ্রচলিত শক্তি ও জৈবসারের ব্যবহার বাড়িয়ে, পেট্রোলিয়ামের অপচয় রোধ করে এবং সর্বোপরি নির্বিচারে বৃক্ষনিধন বন্ধ করে ও বনসৃজন ঘটিয়ে উষ্ণায়নের মাত্রা নিঃসন্দেহে কমানো সম্ভব হবে।

উপসংহার ঃ শিক্ষিত বিজ্ঞান সচেতন মানবগোষ্ঠীর সর্বাগ্রে প্রয়োজন নিজেদের মধ্যে বিশ্ব উষ্ণায়নের কুফল বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। আগামী প্রজন্মকে অবশ্যমারী ধ্বংসের অভিমুখ থেকে প্রত্যাগমন করানোর জন্য বিশ্ববাসীকেই এগিয়ে আসতে হবে। তা ছাড়া স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, ধর্মীয় গোষ্ঠী, সরকার - সকলকেই সাধ্যমতো প্রয়াসী হতে হবে। প্রয়োজনে দেশের সরকার বা রাষ্ট্রপুঞ্জকেও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

বাঙালির উৎসব

7.3 ভূমিকা ঃ 'প্রতিদিন মানুষ ক্ষুদ্র, একাকী কিন্তু উৎসবের দিনে মানুষ বৃহৎ'। সেদিন যে সমস্ত মানুষের সঙ্গে একত্র হইয়া বৃহৎ, সেদিন সে সমস্ত মনুষ্যত্বের শক্তি অনুভব করিয়া মহৎ। উৎসব হল আনন্দময় অনুষ্ঠান। বাঙালির ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের মেঘ বার বার ঘনিয়ে এলেও বাঙালির আনন্দস্রোতে কখনো ভাঁটা পড়েনি। কথায় বলে - বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বন। বাঙালি সারাবছর ধরে নানারঙে সাজিয়েছে তার উৎসবের ডালি। বাঙালি এই উৎসবের দিনগুলি থেকেই সঞ্চয় করে নিয়েছে তার বাঁচার উপাদান।

উৎসবের নানা রূপ ঃ বাংলার বিভিন্ন উৎসবগুলিকে মূলত চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন- ধর্মীয় উৎসব, সামাজিক উৎসব, ঋতু উৎসব ও জাতীয় উৎসব।

ধর্মীয় উৎসব ঃ হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি ধর্মাবলম্বী মানুষদের নিয়ে এই উৎসবগুলি পালিত হয়। তবে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা। এ ছাড়া ঈদ, মহরম, বড়দিন, গুড ফ্রাইডে, বুদ্ধ পূর্ণিমা, গুরুনানকের জন্মদিন উপলক্ষে মহা সমারোহে ধর্মীয় উৎসবগুলি পালিত হয়।

সামাজিক উৎসব ঃ অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ, জন্মদিন - এই অনুষ্ঠানগুলিকে কেন্দ্র করে সামাজিক উৎসব পালিত হয়। এক্ষেত্রে পরিবার, পরিজন, বন্ধু, প্রতিবেশিদের নিয়েই সামাজিক একটা বন্ধন গড়ে ওঠে।

ঋতু উৎসব ঃ ছয়টি ঋতুকে কেন্দ্র করে বাঙালিরা বিভিন্ন উৎসব পালন করে থাকে। নববর্ষ, পৌষপার্বন, নবান্ন, হোলি, বর্ষা বন্দনা এইসব ঋতুকেন্দ্রিক উৎসবের মধ্য দিয়ে দুঃখ-দারিদ্র, অভাবপীড়িত বাঙালি নতুন করে নব আনন্দে জেগে ওঠে।

জাতীয় উৎসব ঃ জাতীয় উৎসবগুলি যদিও সমগ্র দেশ জুড়েই পালিত হয় তবুও এই জাতীয় উৎসবগুলি বাঙালি জীবনে প্রভাব বিস্তার করে। স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস, গান্ধীজীর জন্মদিন, নেতাজীর জন্মদিন এই দিনগুলি বিভিন্ন স্কুলে, কলেজে, ক্লাবে পতাকা উত্তোলন ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়।

উপসংহার ঃ বাঙালি মাত্রই উৎসব প্রিয়। তাই যে কোন বিষয়কেই তারা উৎসবে রূপায়িত করে। বর্তমানে ঐতিহ্যবাহী উৎসবগুলির পাশাপাশি গ্রামীণ ঐতিহ্যকে মনে রেখে কিছু নাগরিক উৎসবের সূচনা ঘটেছে। যেমন - পিঠে পুলি উৎসব, ইলিশ উৎসব, বন মহোৎসব, মাটি উৎসব, লোক উৎসব ইত্যাদি। নানা সাংস্কৃতিক উৎসবকেও বাঙালি তার জীবনযাত্রার অঙ্গ করে তুলেছে। এর মধ্যে চলচ্চিত্র উৎসব, নাট্য উৎসব, কবিতা উৎসব, বইমেলা, সঙ্গীতমেলা ইত্যাদি। কলকাতার আন্তর্জাতিক বইমেলার পাশাপাশি বিভিন্ন জেলার আঞ্চলিক বইমেলাগুলিতে উৎসবের মেজাজ তৈরি হয় আঞ্চলিকভাবে। উৎসব হল মিলন প্রাঙ্গণ। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আনন্দে মেতে ওঠা, বাঙালির উৎসবকে সার্থক করেছে। বাঙালির উৎসবকে সার্থক করেছে। বাঙালির জীবন প্রবাহের সাথে উৎসব অনুষ্ঠানের ধারা সমান্তরালভাবে বয়ে চলবে অনন্তকাল।